History (UG)
Second Sem
Paper – CC3

কণিষ্কের রাজত্বকালের গুরুত্ব ঃ

কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন যা মধ্য-এশিয়া থেকে মথুরা বারাণসী এবং সম্ভবত বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্য গঠনেই তাঁর প্রতিভা এবং কর্মদক্ষতার অবসান ঘটেনি। তিনি সাম্রাজ্যের প্রশাসন, শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি, স্থাপত্য ভাস্কর্য প্রভৃতি উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে জনজীবনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

রাজনৈতিক ঐক্য এবং সাম্রাজ্য স্থাপন ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তা দূর করে কণিষ্ক ভারতের এক বিশাল অংশে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন। কণিষ্কের সাম্রাজ্য পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্কের পূর্বে কোনো ভারতীয় নৃপতি মধ্য এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কখনও সাম্রাজ্যবিস্তার করতে পারেননি। কণিষ্কের মধ্যে একাধারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সামরিক ক্ষমতা ও অশোকের ধর্মানুরক্তির সমন্বয় দেখা যায়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয়করণ ঃ কণিষ্কের আমলে কুষাণ সাম্রাজ্যের ভারতীয়করণ সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁর বাসস্থান ও রাজধানী হিসাবে পুরুষপুর বা পেশোয়ার শহরটিকে বেছে নেন। পেশোয়ার নগরীকে তিনি সংঘারাম, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতির দ্বারা রমণীয় করেন। পেশোয়ারে তিনি সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য সংঘারাম নির্মাণ করেন। কণিষ্কের শাসনকালে মথুরা, বারাণসী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতি নগরী সমৃদ্ধিশালী ছিল।

অর্থনৈতিক উন্নতি ঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে কণিষ্কের রাজত্বকালকে বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ বলা যায়। কণিষ্কের শাসনকালে ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে খুবই উন্নতি ঘটে। চিনা রেশম মধ্য এশিয়া হয়ে সিন্ধুবন্দর বারবারিকাম থেকে রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি হতে থাকে। ভারতীয় মশলা, চন্দন, হাতির দাঁতের দ্রব্য, মৃগনাভি, হীরা প্রভৃতি রোমান সাম্রাজ্যে রপ্তানি হত। তাঁর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে প্রচুর পরিমাণে সোনা, চিন এবং রোম থেকে ভারতবর্ষে আসলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। ইন্দো-পার্থিয়ানদের হীনমান মুদ্রায় পাঁচ ভাগের চারভাগ ছিল তামা এবং একভাগ ছিল রূপা। এর সঙ্গে কণিষ্কের স্বর্ণমুদ্রার তুলনা করলে উভয়যুগের তারতম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কণিষ্ক মুদ্রায় গ্রিক এবং প্রাকৃতের পরিবর্তে ব্যাকট্রীয় ভাষা ব্যবহার করেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঃ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁর মুদ্রা থেকে অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার কথা জানা যায়। কণিষ্ক ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দূর করার জন্য চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ পৌরোহিত্য করেন। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম

ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে মধ্য এশিয়া পার হয়ে দূর প্রাচ্যে প্রসারিত হয়। কণিষ্ক চিন, জাপান, তিব্বত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে 'মহাযান' প্রচারক প্রেরণ করেন। তাছাড়া তিনি অগণিত বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করে বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাহিত্য এবং শিল্পের উৎকর্ষ ঃ জন্মসূত্রে বিদেশি হলেও কণিষ্ক ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদেশি শাসনক হয়েও তিনি যেভাবে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। তাঁর রাজসভা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর। তাঁর রাজসভায় ছিলেন এ যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, অশ্বঘোষ; রাষ্ট্রনীতিবিদ বৌদ্ধপণ্ডিত বসুমিত্র, এছাড়া শিক্ষাগুরু পার্শ্ব। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মাথর কুষাণ সম্রাটের অন্যতম মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক চরক, স্থপতি এজেসিলাস, দার্শনিক পণ্ডিত নাগার্জুন প্রমুখ। এছাড়া সংসর্বকও কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। অশ্বঘোষের রচিত দুটি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম সৌন্দরানন্দ ও বুদ্ধচরিত, মহাযানশ্রদ্ধোৎপদ বজ্রসূচি, 'গণ্ডিস্তোত্রগাথা' প্রভৃতি আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন তিনি। প্রথম গ্রন্থটি মহাযান বৌদ্ধধর্মের ওপর লেখা, দ্বিতীয় গ্রন্থে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। এই সময় নাগার্জুন তাঁর মহাজান দর্শন মূলক প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। সেই প্রাচীন যুগে তাঁর বিখ্যাত 'মাধ্যমিক সূত্র' গ্রন্থে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (Theory of Relativity)-এর প্রাথমিক সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

কণিষ্কের রাজসভা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক, রোমান, বৌদ্ধ এই তিন শিল্পরীতির সংমিশ্রণে 'গান্ধার শিল্প' সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। গান্ধার শিল্পের নিদর্শন তক্ষশিলা, আফগানিস্তান বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে কয়েকটি জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় গান্ধার শিল্পের প্রভাব চিনা তুর্কিস্থান, সুদূরপ্রাচ্য এমনকি চিন ও জাপানের শিল্পরীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কণিষ্কের আমলে মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি অঞ্চলে সম্পূর্ণ দেশীয় শিল্পরীতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। মথুরায় পাওয়া কণিষ্কের কবন্ধ মূর্তি এই শিল্পরীতির পরিচয় দেয়। একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল বাহ্লীক দেশে।

কণিষ্কের স্থাপিত পেশোয়ারের বিহার ছিল এই যুগের বিস্ময়। হিউয়েন সাঙ এই সংঘারামের কথা বলেছেন। এছাড়া তক্ষশিলা, মথুরা এবং কাশ্মীরে কণিষ্ক বহু চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি যাবতীয় শান্তি এবং সমৃদ্ধিসূচক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর রাজত্বকাল

স্মরণীয় হয়ে আছে। সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বকালের অবদান গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশে চরম পরিণতি লাভ করে। Dr. H.G. Rowlingon-এর মন্তব্য "The Kushana period is a fitting prelude to the age of the Guptas."

কণিষ্ক এবং অশোকর তুলনা ঃ

মৌর্য সম্রাট অশোকের সঙ্গে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের তুলনা করা যায়। (ক) উভয়েই সিংহাসনে আরোহণের এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। (খ) উভয়েই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। (গ) উভয়েই বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে এবং বৌদ্ধসংঘের দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সমভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন এবং কণিষ্ক গান্ধার কিংবা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ 'বৌদ্ধ সঙ্গীতি' আহ্বান করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ঐক্য এবং সংহতি স্থাপন করা। মৌর্য সম্রাট অশোক ভারত, সিংহল এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। এককথায় ধর্মীয় ব্যাপারে অশোকের অসমাপ্ত কার্য কণিষ্ক সম্পন্ন করেন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করে কোনো কোনো ঐতিহাসিক কণিষ্ককে 'দ্বিতীয় অশোক' নামে অভিহিত করে থাকেন।

দুজনের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। অশোক ছিলেন হীনযান ধর্মমতে বিশ্বাসী। কণিষ্ক ছিলেন মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসী। কিন্তু কণিষ্ক কখনোই অশোকের মতো অহিংসা নীতি গ্রহণ করেননি। এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করেননি। চারিত্রিক মহানুভবতা এবং ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে অশোক কণিষ্ক অপেক্ষা অনেক উচ্চমানের ছিলেন। এই কারণে কণিষ্ককে 'দ্বিতীয় অশোক' বলে অভিহিত করা হলে অশোকের মহত্ত্বকে ম্লান করা হয়।

কুষাণ শাসনব্যবস্থা ঃ

কুষাণ শাসকেরা ভারতবর্ষের এক বিশাল এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য কণিষ্ক তথা কুষাণেরা এক সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। কুষাণ শাসনব্যবস্থায় বৈদেশিক এবং ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাঁদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় চিন ও পারস্যের প্রভাব পড়েছিল।

কুষাণ রাজাদের মুদ্রা এবং অনুশাসনলিপি থেকে কুষাণ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া হৌ-হান-সু গ্রন্থ থেকে কুজল কদফিসের আমলের ও যুবরাজ হিসাবে বিম কদফিসের আমলের শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ঃ কুষাণ রাজাদের মুদ্রা এবং অনুশাসনলিপি থেকে কুষাণ শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কুষাণ শাসনব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দ্বৈতশাসন (দ্বৈরাজ্য) ব্যবস্থা। এই অদ্ভুত ধরনের শাসনের প্রমাণ মেলে কণিষ্কের সময় থেকে। এই শাসন কাঠামোয় সম্রাটের সঙ্গে সহযোগী শাসক হিসাবে কখনও পুত্র বা পৌত্র, আবার কখনও ভ্রাতুষ্পুত্র শাসন করতেন। যেমন কণিষ্কের সঙ্গে তাঁর পুত্র বাসিষ্ক এবং বাসিষ্কের সঙ্গে হুবিষ্ক যুবরাজ হিসাবে শাসন করতেন।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিন্যাস ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিন্যাস নিয়ে তিনটি ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথম, অনেকে মনে করেন কুষাম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগঠন স্তরবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ কুষাণ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার মূল চরিত্র ছিল বিকেন্দ্রীভূত। অপরদিকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন কুষাণ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত ও আধিপত্যবাদী। তৃতীয় অভিমত হল কুষাণ প্রশাসন সামন্ততান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক – এই দুই উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কুষাণ শাসনব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক শক্তিগুলির সমন্বয় লক্ষ করেছেন।

দৈবশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ ঃ কুষাণ সম্রাটেরা রাজার দৈবস্বত্বে বিশ্বাস করতেন। কুষাণ সম্রাট বাসিষ্ক তাঁর এক লিপিতে নিজেকে 'দেবমানব' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রস্তর লিপিতে দ্বিতীয় কণিষ্কের নামের সঙ্গে যে উপাধিগুলি দেখা যায় তা হল 'মহারাজ', 'রাজাধিরাজ', 'দেবপুত্র' কাইজর। এই উপাধিগুলি সম্ভবত চিনা এবং রোমক সম্রাটের প্রথা অনুসরণে গৃহীত হয়েছিল। কুষণ রাজাদের মুদ্রায় তাঁদের প্রতিকৃতির সঙ্গে মেঘ, অগ্নিশিখা, মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয় ইত্যাদি যুক্ত করে সাধারণের দৃষ্টিতে রাজাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। মনুর মতে ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, বরুণ ও কুবের এই অষ্টদেবতার অঙ্গ নিয়ে রাজার দেহ গঠিত হয়। দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভারত ইতিহাসের সন্ধানে গ্রন্থে বলেছেন 'রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ করে কুষাণেরা ভারতে নিজেদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।' নীতিগতভাবে কুষাণেরা ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের রাজকীয় অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করত। প্রথমত, তিনি তাঁর অনেক ক্ষমতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অর্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র ও উপজাতি ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল।

কুষাণ সাম্রাজ্য কয়েকভাবে বিভক্ত ছিল। যথা – রাষ্ট্র, অহর, সত্রাপি – জনপদ, দেশ ও বিষয়। কুষাণ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি ছিল ক্ষত্রপ শাসন। 'ক্ষত্রপ' এবং 'মহাক্ষত্রপ' উপাধিগুলি মূলত ছিল পারসিক এবং সেগুলি সরাসরি শকদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। ক্ষত্রপরা ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ভারতীয় ক্ষত্রপরা একরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষত্রপপদ বংশানুক্রমিক হতে পারত। বিদেশি উপাধিধারী কর্মচারীরা উচ্চপদে নিযুক্ত থাকতেন। যথা সামরিক প্রশাসক বা স্ট্রাটিগোস (Strategos)-জেলা শাক বা মেরিডার্ক (Meridarch)। বিদেশি কর্মচারীরা অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নিযুক্ত থাকতেন। এই ক্ষত্রপরা অনেক সময় 'রাজন' উপাধি গ্রহণ করতেন। দেশীয় কর্মচারীদের নামকরণ হত মহাসেনাপতি, অমাত্য প্রভৃতি।

মন্ত্রী পরিষদ ঃ কণিষ্কের মন্ত্রীপরিষদ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিতেন। তাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন মাথর। সূত্রালঙ্কারে দেবধর্ম নামে অপর একজন মন্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কণিষ্কের অন্যান্য পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন আধ্যাত্মিক গুরু অশ্বঘোষ, চিকিৎসক চরক এবং পুরোহিত সংঘরক্ষা।

প্রশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র কুষাণ সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল কয়েকটি প্রদেশে। এগুলিকে বলা হত 'সত্রাপি'। কখনও কখনও শাসনভার মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপ উপাধিধারী দুজন প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকত। আবার কখনও বা ক্ষত্রপ উপাধিধারীকে অঞ্চল শাসনের ভার দেওয়া হত। প্রথম কণিষ্কের রাজত্বকালে মহাক্ষত্রপ খরপল্লান ও ক্ষত্রপ বনস্কর একসঙ্গে কাশী এবং বারাণী অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। হুবিষ্কের রাজত্বকালে নহপান পশ্চিমে ভারতের ক্ষত্রপ ছিলেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্যান্য মহাক্ষত্রপদের তুলনায় নহপান অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বনামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেছিলেন। মুদ্রায় তাঁকে রাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্র শাসিত উপজাতিদের মধ্যে ভরতপুরের যৌধেয়গণের, আগ্রার নিকটবর্তী অর্জুনায়নগণের, সুরাষ্ট্রের আভীরগণের এবং রাজস্থানের মালবগণের উল্লেখ করা চলে। বাহাওয়ালপুরের নিকটস্থ যৌধেয়গণের বসতি নিশ্চিতভাবে কণিষ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তাঁর রাজত্বের একাদশ বর্ষে সুই বিহার লেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

কণিষ্কের শাসনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল গ্রাম। কুষাণ লেখে গ্রামিকের উল্লেখ আছে। এই পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। গ্রামিক গ্রামের রাজস্বের একটি অংশ ভোগ করতেন। মনুসংহিতার সাক্ষ্য থেকে মনে হয় তিনি সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পেতেন না। গ্রামিক ছাড়া দশগ্রামপতি,

বিংশশতীশ, শতেশ, সহস্রপতি ইত্যাদি রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। এদের কারোকই সরকার থেকে সরাসরি বেতন দেওয়া হত না। শতেশ এবং সহস্রপতি যথাক্রমে একটি গ্রাম ও একটি নগরের রাজস্ব ভোগ করতেন।

কুষাণ শাসনব্যবস্থায় চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী ছিল। এই সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি একদিকে রাজ্য জয় করতেন এবং অপরদিকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। কণিষ্কের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ সেনাপতি বা দণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রদেশ শাসনের কাজে সাহায্য করতেন। এছাড়া মহাদণ্ডনায়ক নামক আরেকটি পদের কথা জানা যায়। এরা সম্ভবত সামরিক এবং বেসামরিক উভয় প্রকার দায়িত্বই পালন করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় স্থায়ী সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন মহাদণ্ডনায়ক। মানিকিওয়ালা লেখতে লাল নামে এক দণ্ডনায়কের নাম পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য শাসনের কাজে তিনি বহুসংখ্যক কুষাণ, শক এবং গ্রিকদের নিযুক্ত করেছিলেন। কুষাণদের সামরিক সংগঠন নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং সুগঠিক ছিল কারণ শক্তিশালী এবং সংগঠিত সেনাবাহিনী ছাড়া ওই বিশাল ভূখণ্ডের ওপর দীর্ঘকালব্যাপী নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হত না।

মনু ঘুষখোর রাজপুরুষের উল্লেখ করেছেন। এসব অসাধু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের সর্বস্ব অধিগ্রহণ করে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকৃতি ঃ কুষাণ শাসনব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনার পর এর চরিত্র বা প্রকৃতি কেমন ছিল সে বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে কুষাণ শাসকেরা 'দেবপুত্র' অভিধা গ্রহণ করতেন। এ থেকে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে রাজার দৈব অধিকারের নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। এই নীতি অনুযায়ী পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সাধারণভাবে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার রূপ নেয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে দেখা যাবে যে বাস্তবে কুষাণরা স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না। কারণ তাঁদের সাম্রাজ্য মৌর্যদের ন্যায় অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ছিল না। প্রদেশ বা সত্রাপিতে বিভক্ত করে কিছু প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপদের স্বাধীনতা প্রদান করে সুশাসন প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

কণিষ্কের পরবর্তী শাসকেরা ঃ

কণিষ্কের উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কণিষ্ক নিজ অব্দের ২৩ তম বর্ষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকালে শেষ হয় ১০১ খ্রিষ্টাব্দে। কণিষ্কের রাজত্বের শেষভাগে বাসিষ্ক (২০–২৮ অব্দ) সহযোগী শাসক হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

কণিষ্কের পর তিনি সম্রাট হন। তিনি ২০–২৮ অব্দ অর্থাৎ ৯৮–১০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। মথুরা, পূর্ব মালব এবং কাশ্মীরে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তারপর হুবিষ্ক ২৬–৬০ অব্দ (অর্থাৎ ১০৪–১৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ৩৪ বছর রাজত্ব করলেও তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর নামাঙ্কিত অসংখ্য স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রা তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সমৃদ্ধ রাজত্বকালের পরিচয় দেয়। কাবুলের প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে ওয়ারডক নামেক স্থানে তাঁর একটি লেখ পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে আফগানিস্তান তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। হুষ্ক এবং হুবিষ্ক একই ব্যক্তি বলে অনুমান করা হয়। সেই ক্ষেত্রে বলা যায় যে কাশ্মীর তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজতরঙ্গিণী অনুযায়ী তিনি কাশ্মীরে হুষ্কপুর নামে একটি নগর নির্মাণ করেছিলেন। এই স্থানটি ছিল কাশ্মীর উপত্যকার অভ্যন্তরে, বরমূলা গিরিবর্ত্ম পার হয়ে। স্টেন বর্তমান উসকুর গ্রামকে প্রাচীন হুষ্কপুর বলে চিহ্নিত করেছেন। হুষ্কপুরে হুবিষ্কের সমকালীন আর একজন রাজা ছিলেন দ্বিতীয় কণিষ্ক। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর একটি লিপি (যার তারিখ ৪১, অর্থাৎ ৪১ + ৭৮ = ১১৯ খ্রিষ্টাব্দ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরা নামক স্থানে পাওয়া গেছে। একমাত্র আরা লেখ ভিন্ন তাঁর অন্য লেখ পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কণিষ্ক কিছুকাল হুবিষ্কের সহযোগী সম্রাট ছিলেন, তিনি রোমান সম্রাটদের অনুকরণে 'কাইজার' (Kaiser) উপাধি গ্রহণ করেন। মনে করা হয় যে হুবিষ্কের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কণিষ্কের পর শেষ উল্লেখযোগ্য কুষাণরাজ ছিলেন প্রথম বাসুদেব। সম্ভবত তিনি হুবিষ্কের পুত্র ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল "শাহানোশাহ বাসুদেব কুষাণ"। তার নাম কুষাণ রাজপরিবারের সম্পূর্ণ ভারতীয়করণের ইঙ্গিত বহন করে। মুদ্রায় অঙ্কিত বাসুদেবের অঙ্গে বিদেশি পোশাকের সুস্পষ্ট চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শৈব। তাঁর মুদ্রায় বিদেশি দেবদেবীর উপস্থিতি ছিল না। এমন নয়, তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম, সে তুলনায় এককভাবে শিবের; অথবা যৌথভাবে শিব এবং নন্দীর নিদর্শন অনেক বেশি। প্রথম বাসুদেবের লেখ শুধুমাত্র মথুরা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর কোনো লেখা পাওয়া যায়নি। তাই অনেকে মনে করেন যে তাঁর রাজ্য এই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যতম অনুসারে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল এবং আফগানিস্তান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি ১৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রথম বাসুদেবের পরবর্তী কুষাণ রাজাদের সম্বন্ধে সাহিত্য উপাদান বা লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে তাঁদের কিছু সংখ্যক মুদ্রা যায়। কিন্তু তা থেকে এদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রথম বাসুদেবের পরে তৃতীয় কণিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেব ছিলেন এইমত জানা যায়। ড. বি.এন.

মুখার্জি প্রমুখের মতে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের যুগেও এই সাম্রাজ্য ব্যাকট্রিয়া হয়ে তাসখন্দ ও কাশগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলা থেকে আবিষ্কৃত একটি বাহ্লীক ভাষায় লিখিত নামমুদ্রার ছাঁচে কনেষ্কো নামক রাজার নাম দেখা যায়। বি.এন. মুখোপাধ্যায় তাঁকে তৃতীয় কণিষ্ক বলে শনাক্ত করেছেন।

কুষাম সাম্রাজ্যের ভারতীয় অঞ্চল স্থানীয় মাঘ ও নাগ বংশীয় রাজারা অধিকার করে নেন। কুষাম সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের ওপর যে নতুন রাজ্যগুলির উদ্ভব হয় তা হল (১) মথুরা, পদ্মাবতী (উত্তরপ্রদেশ) নাগবংশ, (২) শতদ্রু উপত্যকায় যৌধেয় বংশ, (৩) মথুরার পূর্বে মাঘ বংশ, (৪) রাজপুতানায় মালব, (৫) যমুনা উপত্যকায় কুনিন্দ, (৬) পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমে শক ও শিলাক, (৭) মধ্যপ্রদেশের সাঁচী, দিল্লি ও আগ্রায় কাক, প্রার্জুন, খরপারিক, আভীর প্রভৃতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শক্তির (যেমন – যৌধেয়, অর্জুনায়ন, পাঞ্জাবের যৌধেয়, রাজপুতানার মালব প্রভৃতি উপজাতি সমূহের বিদ্রোহের কথা বলে থাকেন। মথুরা অঞ্চল চলে যায় নাগদের অধীনে। পশ্চিম ভারতে শক ক্ষত্রপদের সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

দুর্বল উত্তরাধিকারী ঃ কণিষ্কের পর যে সব উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনে বসেন তাঁরা সকলেই ছিলেন দুর্বল। তাঁদের শাসনাধীনে কিছুদিন কুষাণ সাম্রাজ্যের রাষষ্টরীয় অখণ্ডতা বজায় থাকলেও তা স্থায়ী হয়নি। প্রথম বাসুদেব ছিলেন এই বংশের শেষ নরপতি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ঃ কুষাণরা বাহুবলে ভারত ও ভারতের বাইরে বেশ কিছু অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু নববিজিত অঞ্চলগুলিতে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গেলে যে ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা সে যুগে ছিল না। তাছাড়া কুষাণদের গুপ্তচর ব্যবস্তা সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না।

বাণিজ্যে অবনতি ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। একসময় মথুরা, বারাণসী, পেশোয়ার, তক্ষশিলা বাণিজ্যের জন্য যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা বিনষ্ট হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে শকরাজ রুদ্রদামন নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল দখল করলে কুষাণ বাণিজ্য কুষাণদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এছাড়া রোমান এবং আরব বণিকেরা মৌসুমি বায়ুর গতিপথ আবিষ্কার করার

ফলে এই বায়ুতে জাহাজ চালিয়ে বারিগাজা ও দক্ষিণ ভারতের বন্দরে সোজা চলে আসে। এর ফলে কুষাম সাম্রাজ্য আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুষাম সাম্রাজ্যের পতনের এটি একটি প্রদান কারণ বলা চলে।

সাসানীয় আক্রমণ ঃ সাম্প্রতিক গবেষণার ওপর নির্ভর করে এখন নিশ্চিত করা যায় যে মোটামুটিভাবে তৃতীয় শতাব্দীর শেষে কুষাম সাম্রাজ্যের পতনের জন্য পারস্যের সাসানীয় বংশ প্রধানত দায়ী ছিলেন। ড. বিন.এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে প্রকৃতপক্ষে কুষাণ সাম্রাজ্য যখন সাসানীয়দের কাছে আত্মসর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখনই এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ২৬২ খ্রিষ্টাব্দের নক্‌শ-ই-রুস্তম লিপি থেকে জানা যায় যে কুষাণ সম্রাট সাসানীয় সম্রাট প্রথম সাপুরের (১৪১–২৭২ খ্রিঃ) কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। কারণ কুষাণ রাজ্য তাসখন্দ, কাশগড়, পেশোয়ার প্রথম সাপুরের রাজ্য বলে উল্লিখিত হয়। বলা যায় যে, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অর্থনৈতিক অবনতি সম্মিলিতভাবে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

—- o —